ডায়রিয়া রোগ নির্ণয় ... ৩
মায়ের দুধ ... ৫
ঘরে-তৈরি স্যালাইন ... ৮

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৪ সংখ্যা ৩

কার্তিক ১৪০২

রোগ-প্রতিরোধক খাবার

ডাঃ এম. আমিনুল ইসলাম
ডাঃ নাসিমা জে. আমিন

শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখার জন্য বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের দরকার হয়। উপাদানগুলো হলো: আমিষ, শ্বেতসার, স্নেহ, খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ লবণ যা আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার থেকে পেয়ে থাকি, যেমনঃ শস্যজাতীয় খাদ্য, ডাল, তেল, শাক-সব্জি, দুগ্ধজাত খাদ্য ও মাছ-মাংস জাতীয় খাদ্য। আমিষ, শ্বেতসার ও স্নেহজাতীয় খাদ্য দহন প্রক্রিয়ায় আমাদের দৈনন্দিন কাজ করার শক্তি যোগায়। আমিষজাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজ হচ্ছে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিড (amino acid) সরবরাহ করা, যা শরীর গঠনে সাহায্য করে। স্নেহজাতীয় খাদ্য শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড (fatty acid) সরবরাহ করে থাকে। ভিটামিন ও খনিজ লবণ শরীরের তাপ উৎপাদনে সরাসরি কোনো সাহায্য না করলেও এগুলো শরীরের বিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে এবং খনিজ লবণ শরীরের কাঠামো গঠনে সাহায্য করে। এই ভিটামিন ও খনিজ লবণের অভাবজনিত রোগ আমাদের দেশের জন্য, বিশেষতঃ শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য একটা বিরাট সমস্যা। কাজেই রোগ-প্রতিরোধক খাবার সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা উচিত। কোন্ কোন্ খাবারের অভাবে কী কী রোগ হয় এবং কী কী খাবার খেলে তা প্রতিরোধ করা যায় এখানে আলোচনা করা হলো:

ভিটামিন এ ঃ এটি এক প্রকারের চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন। পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের অন্ধত্বের প্রধান কারণ হচ্ছে খাদ্যে এই ভিটামিনের অভাব। প্রতি বছর প্রায় ৯ লক্ষ শিশু এই ভিটামিনের অভাবজনিত চক্ষুপীড়ায় ভোগে এবং এদের মধ্যে প্রায় ৩০,০০০ অন্ধ হয়ে যায়। এই অকাল অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে শিশুদের ভিটামিন এ-যুক্ত খাবার খাওয়াতে হবে। প্রাণীজ খাবারের মধ্যে ঘি, মাখন, দুধ, ডিমের কুসুম, কলিজা ইত্যাদি থেকে ভিটামিন এ পাওয়া যায়। বড় বড় মাছের তেল থেকেও ভিটামিন এ পাওয়া যায়। আমাদের মত দরিদ্র দেশে অধিকাংশ মানুষ দামের কারণে এসব প্রাণীজাত খাদ্য খেতে পারেন না। তবে প্রয়োজনীয় ভিটামিন এ'র চাহিদা পূরণের জন্য প্রচুর পরিমাণে শাক-সব্জি খাওয়া যেতে পারে। সবুজ শাক ছাড়াও মিষ্টি কুমড়া, পাকা

পেঁপে, পাকা আম ইত্যাদি হলুদ রঙের ফলমূল, ছোট মাছ ইত্যাদি সস্তা খাবার থেকেও শরীর প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ তৈরি করতে পারে।

ভিটামিন এ'র অভাবজনিত অন্ধত্ব রোধে ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের প্রতি ৬ মাস অন্তর-অন্তর ভিটামিন এ খাওয়ানো হয়। এই ব্যবস্থায় শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ শিশু ভিটামিন এ পেয়ে থাকে। সেজন্য মায়েদের সচেতন হতে হবে, যাতে তাঁরা ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদের শাক-সব্জি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলেন। আঙিনার অল্প কিছু জায়গায় শাক-সব্জির চাষ করে বছরের প্রায় সবসময় পরিবারে ভিটামিন এ'র চাহিদা মেটানো সম্ভব।

ভিটামিন বি: অনেক ধরনের ভিটামিন বি আছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি আমাদের শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। এগুলো পানিতে দ্রবণীয় বলে শরীরে জমা থাকে না। তাই প্রতিদিনের খাবারের মাধ্যমে শরীরে এদের চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে।

ভিটামিন বি-১ বা থায়ামিন: এই ভিটামিনের অভাবে 'বেরিবেরি' নামক একধরনের রোগ হয়ে থাকে। এ-রোগে স্নায়ু দুর্বল হয়ে যায় এবং হৃদপিন্ডের কর্মক্ষমতা কমে যায়। কলে ভাঙানোর ফলে চালের উপরের পাতলা আবরণ চলে যায়। এই পাতলা আবরণে প্রচুর থায়ামিন

(৪ এর পাতা দ্রষ্টব্য)

বাতজ্বর : প্রতিকার ও প্রতিরোধ

ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা

পত্রিকায় প্রায়ই অসুস্থ শিশু বা কিশোরের ছবি ছাপিয়ে আবেদন জানানো হয় 'এর হার্টের ভাল্ব নষ্ট হয়ে গেছে—জরুরী অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন।' চিকিৎসার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন, তাই তাঁর অসহায় অভিভাবক এভাবে সাহায্যের আবেদন জানান। এই শিশুটি বা কিশোরটির অবস্থা কেন এমন হলো এবং এর প্রতিরোধ কি সম্ভব ছিল? হ্যাঁ ছিল, কিন্তু তার অভিভাবক সচেতন না থাকায় রোগের শুরুতে উপযুক্ত চিকিৎসা হয়নি, ফলে এটি এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

অনেক সময় গিরায়-গিরায় ব্যথা ও অস্বাভাবিক দুর্বলতা নিয়ে রোগী একজন চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে পরামর্শ চায়। এদের পরামর্শ দেওয়ার পূর্বে ভালভাবে জেনে নিতে হবে বিগত এক মাসের মধ্যে তাদের কোনো গলা ব্যথা ও জ্বর হয়েছিল কিনা? রোগীর বয়স যদি ৫ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে হয়, তবে অবশ্যই বাতজ্বরের চিন্তা করতে হবে। বাংলাদেশে অনেককে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে (স্যাঁতস্যাঁতে, আলো-বাতাসহীন ঘরে) বাস করতে হয়। অনেকে আবার অপুষ্টিতেও ভোগে, ফলে ৫ থেকে ১৫ বছরের শিশু-কিশোরদের বাতজ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আমাদের দেশে এই বয়সের শিশু-কিশোরদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে বাতজ্বর।

বাতজ্বর কেন হয়?

একটি বিশেষ ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে ৫ থেকে ১৫ বৎসরের শিশু-কিশোরদের জ্বর ও গলা ব্যথা হয়। পরবর্তীকালে জ্বর ও গলা ব্যথা সেরে গেলেও গিরার ব্যথা থেকে যায় এবং আরো পরে হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারে—একেই বলা হয় বাতজ্বর। যে জীবাণু দ্বারা এ-অবস্থার সৃষ্টি হয় তার নাম হচ্ছে 'বিটা হিমোলাইটিকাস স্ট্রেপটোকক্কাস-গ্রুপ এ'।

উপসর্গ

কিশোরদের চেয়ে শিশুরা এ-রোগে বেশি ভোগে। শিশুদের জ্বর ও গলা ব্যথার পরই হৃদযন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হতে পারে। আবার কিছু কিছু কিশোরদের হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে বড় বড় গিরায় পর্যায়ক্রমে ব্যথা হয় এবং গিরা ফুলে যায়। গিরায় প্রচন্ড ব্যথা হওয়ার ফলে কেউ সেখানে স্পর্শ করলে রোগী অসহ্য যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলে। চিকিৎসা না করালে রোগী প্রায়ই এই ধরনের উপসর্গে ভোগে এবং কিছুদিনের মধ্যেই সহজে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া রোগীর শ্বাসকষ্ট হয়, বুক ধড়ফড় করে ও পায়ের পাতা ফুলে যেতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত অঙ্গসঞ্চালন (chorea) হতে পারে। চামড়ার নিচে ছোট ছোট গুটি (subcutaneous nodule) ও শরীরের বিভিন্ন অংশে লালচে দাগ (erythema marginatum) দেখা যেতে পারে। সুচিকিৎসা না হলে রোগীর হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হয়ে ভাল্বগুলো (heart valves) নষ্ট হয়ে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হলে রোগীর জীবন বাঁচাতে হার্টের অপারেশন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। রোগীর এই জটিলতাসমূহের চিকিৎসার জন্য বিশেষ ধরনের হাসপাতাল ও বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়। চিকিৎসার

জন্যও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়, যা সাধারণ লোকের পক্ষে ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

লক্ষণ

রোগের কতগুলো লক্ষণ সহজেই ধরা বা বোঝা গেলেও বেশিরভাগ লক্ষণগুলোই বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হয়। সহজে যে লক্ষণগুলো ধরা বা বোঝা যায় সেগুলো হচ্ছে: রোগীর নাড়ির গতি অনেক বেড়ে যায়, রোগী ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে, বড় বড় গিরাগুলোতে খুব ব্যথা অনুভব করে এবং ব্যথার জায়গায় স্পর্শ করলেই রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ে। এই ধরনের রোগীর যদি জ্বর ও গলা ব্যথার কোনো পূর্ব ইতিহাস থেকে থাকে, তাহলে সময় নষ্ট না করে জরুরী ভিত্তিতে কতগুলো বিশেষ পরীক্ষা করাতে হবে। পরীক্ষাগুলো হচ্ছে : রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে তার এরিথ্রোসাইট সেডিমেন্টেশন রেইট (ESR), এ্যান্টি-ষ্ট্রেপটোলাইসিনও অনুপাত (ASO titre) বেড়েছে কিনা। (প্রতি মিলি লিটারে ২৫০ ইউনিট বা তার চেয়ে বেশি।) এছাড়া রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যাও বেড়ে যায় এবং রক্তস্বল্পতার লক্ষণ দেখা যায় (আয়রন বড়ি খেয়েও উন্নতি হয় না)।

- বুকের এক্স-রে করে দেখতে হবে হৃদযন্ত্রের আকার বড় হয়ে গেছে কিনা।
- গলার ভিতরের শ্লেষ্মা (throat swab) পরীক্ষা করলে হিমোলাইটিক ষ্ট্রেপটোকক্কাই জীবাণু পাওয়া যেতে পারে।
- ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ECG) করলে হৃদযন্ত্রের অস্বাভাবিকতা (হার্ট ব্লকের চিহ্ন) ধরা পরে।
- রোগীর বাতজ্বর হয়েছে কিনা তা একজন স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিত।

(৭ এর পাতায় দেখুন)

ডায়রিয়া রোগ নির্ণয়ে ল্যাবরেটরী পরীক্ষার ভূমিকা

গাজী মোহাম্মদ আলী

ডায়রিয়া চিকিৎসার গোড়ার কথা হলো কি কারণে এ রোগ হয়েছে তা খুঁজে বের করা। বিভিন্ন ধরনের জীবাণু, পরজীবী ও ভাইরাস সংক্রমণের ফলে ডায়রিয়া হয়। এছাড়া কোনো কোনো রোগের উপসর্গ হিসেবেও ডায়রিয়া হতে পারে। প্রাথমিক কারণ হিসেবে যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়াকে দায়ী করা হয় এদের মধ্যে ভিবরিও কলেরি, রিকলাই ও ক্যামপাইলোব্যাকটর অন্যতম। পরজীবীর মধ্যে অ্যামিবা ও জিয়ারডিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ভাইরাসের কারণেও ডায়রিয়া হয়। এদের মধ্যে রোটাভাইরাস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিশুদের ডায়রিয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। কিছু কিছু কৃমি ডায়রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, তবে কৃমি ডায়রিয়ার একটি প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য নয়। যে-সমস্ত জীবাণুর নাম এখানে উল্লেখ করা হলো, এদের কারণে যেধরনের ডায়রিয়া হয় তার লক্ষণ ও প্রকৃতি অনেক সময় আলাদা, আবার কিছু কিছু ডায়রিয়া প্রায় একই রকম লক্ষণ প্রকাশ করে। রোগ নির্ণয়ের জন্য এটি একটি বড় সমস্যা। এসব সমস্যার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরীর সাহায্যে মল পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার পদ্ধতি নির্ণয় করা দরকার। এই লেখায় ল্যাবরেটরীতে মল পরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে:

পরীক্ষা পদ্ধতি

ডায়রিয়ার জীবাণুগুলো সনাক্ত করার জন্য নিচে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করা যায়ঃ

১. অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ডার্ক-ফিল্ড পরীক্ষা

অত্যন্ত কম সময়ে কলেরা রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ও চিকিৎসা শুরু করার জন্য এই পরীক্ষা করা যেতে পারে। মাত্র এক ফোঁটা তরল পায়খানা স্লাইডে দিয়ে ডার্ক-ফিল্ড অনুবীক্ষণযন্ত্রে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে কলেরার জীবাণু দ্রুত গতিতে দৌড়াচ্ছে। একে ছুটন্ত তারার গতির সাথে (shooting star movement) তুলনা করা হয়। জীবাণুর চলার গতিবিধি দেখেই এদেরকে চেনা যায়। ৫ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যেই এই পরীক্ষার ফলাফল জানা যায়।

২. অনুবীক্ষণযন্ত্রে পায়খানা পরীক্ষা

ক. পানি-ঘুটা পরীক্ষা: এই পদ্ধতিতে সামান্য পরিমাণ শক্ত পায়খানা নিয়ে তার সাথে দু'এক ফোঁটা নরম্যাল স্যালাইন মিশিয়ে অনুবীক্ষণযন্ত্রে দেখতে হয়।

খ. আয়োডিন-ঘুটা পরীক্ষা: নরম্যাল স্যালাইনের পরিবর্তে দু'এক ফোটা আয়োডিন (Lugol's iodine) মিশিয়ে পায়খানা পরীক্ষা করা হয়।

গ. ঘনীকরণ পদ্ধতি: এই পরীক্ষায় একটু বেশি পরিমাণ মল নিয়ে ঘন লবণ পানিতে মিশিয়ে শিশির উপরে একটা স্লাইড বসিয়ে রেখে ২০ মিনিট পরে উঠিয়ে এনে পরীক্ষা করা হয়।

এসব পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার ক্রিমির ডিম, অ্যামিবা, জিয়ারডিয়া, লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকা, সিস্ট, ম্যাকরোফেজ (macrophage) ইত্যাদি সনাক্ত করা যায়। লোহিত কণিকা ও শ্বেতকণিকার পরিমাণ বেশি দেখলে রক্ত আমাশার সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

৩. কালচার বা জীবাণু চাষ করে পরীক্ষা

পরীক্ষাগারে বিভিন্ন জাতের জীবাণু চাষ করার জন্য বিভিন্ন রকমের খাবার বা মিডিয়া তৈরি ক'রে এবং উপযুক্ত পরিবেশ (বিশেষ করে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা) সৃষ্টি ক'রে জীবাণুর চাষ করা যায়। এক-এক গোত্রের জীবাণুর জন্য এক-এক ধরনের খাবার মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। সামান্য একটু পায়খানা কাঠির সাহায্যে (rectal swab) সংগ্রহ ক'রে তা কালচার করলে অগণিত জীবাণু বাড়তে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে এ থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি ও পরীক্ষার মাধ্যমে (morphology, serology, staining, biochemical, antibiogram) নির্দিষ্ট জীবাণু সনাক্ত করা যায়। যেমন: ভিবরিও কলেরি, সিগেলা (রক্ত আমাশার জীবাণু), স্যালমোনেলা (টাইফয়েডের জীবাণু) ইত্যাদি।

৪. জীবাণুর উপর ওষুধ প্রয়োগ পরীক্ষা

কোন্ জীবাণু কোন্ ওষুধে সংবেদনশীল তা 'খাবার মাধ্যমে' জীবাণুর ওপর ওষুধের ছোট-ছোট চাকতি (disc) বসিয়ে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রেখে পর দিন দেখা হয়। এ-পরীক্ষার মাধ্যমে রোগের জীবাণুর বিরুদ্ধে সঠিক ওষুধ নির্বাচন করা সম্ভব বলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ-পরীক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশি।

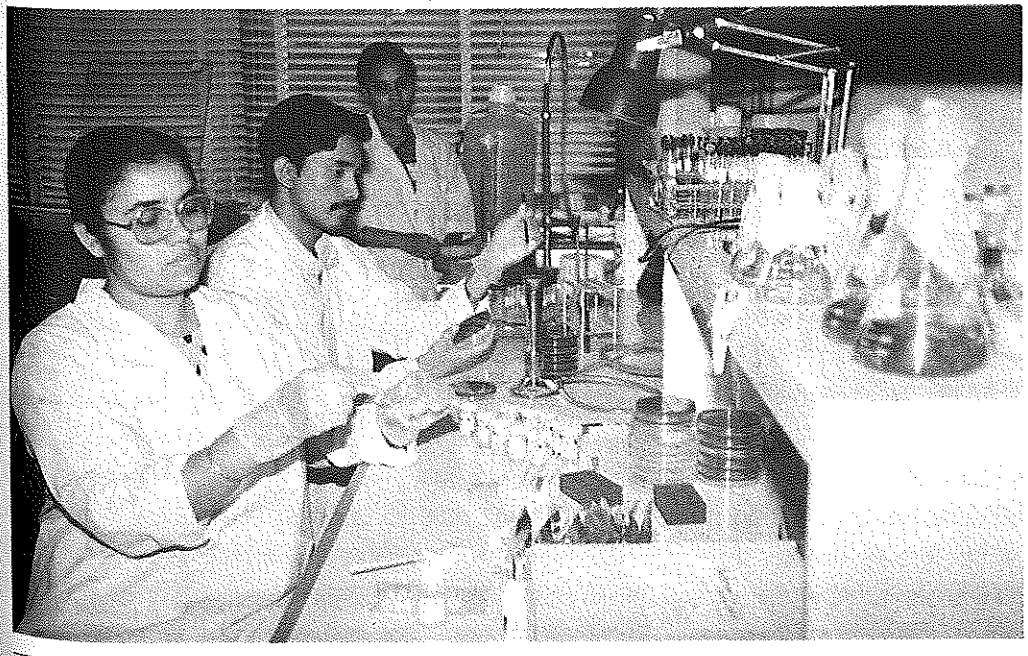

এমনিভাবে ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা ডায়রিয়া রোগের সঠিক তথ্য জেনে রোগীর রোগ নিরাময়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারি। জীবাণুর চাষ ও ওষুধ প্রয়োগ করে পরীক্ষা যদিও ব্যয়বহুল, তবুও সাধারণভাবে পায়খানা পরীক্ষা করে বহু ক্ষেত্রে রোগের সুনির্দিষ্ট কারণ জেনেও রোগীকে চিকিৎসা করা সম্ভব।

রোগ-প্রতিরোধক খাবার

(১ম পাতার পর)

থায়ামিন থাকে। ঢেকি-ছাঁটা চালে এই আবরণ থাকে বলে তা থেকে থায়ামিনের চাহিদা মেটানো সম্ভব। ফলমুল, তরিতরকারি, মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ থেকেও এই ভিটামিনের চাহিদা কিছুটা মেটানো যায়। বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়ার ফলে বর্তমানে এ-রোগ তেমন একটা দেখা যায় না।

ভিটামিন বি-২ বা রাইবোফ্লোবিন: এই ভিটামিনের অভাবে জিহ্বায়, ঠোঁটের কোণায় ও নাকের গোড়ায় ঘা দেখা দেয়। আমাদের দেশের শিশুদের ও মায়েদের মধ্যে এই ভিটামিনের অভাব বেশ দেখা যায়। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাবার, ডিম, কলিজা ও সবুজ শাক-সব্জি থেকে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠির প্রধান খাবার ভাত ও রুটিতে এই ভিটামিন খুব কম থাকে বলে তাদের মধ্যেই এই ভিটামিনের অভাব বেশি দেখা যায়।

ভিটামিন বি-৫ বা থায়াসিন: ভিটামিন বি-৫-এর অভাবে 'পেলাগ্রা' নামক একধরনের রোগ হয়ে থাকে। এ-রোগ হলে পাতলা পায়খানা, মুখে ঘা ও সেই সাথে চামড়ায় ঘা দেখা দেয়। গলা ও হাতের চামড়ায় কটা রঙের দাগ পড়ে ও ছোট-ছোট দানা দেখা দেয়। ডাল, বাদাম ও মাংস থেকে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। চাহিদার একটা বিরাট অংশ আসে 'ট্রিপটোফান' নামক এক প্রকার আমিষ থেকে। দুধে এই আমিষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এ-রোগ তেমন একটা দেখা যায় না। ভূট্টা যাদের প্রধান খাদ্য, তাদের এ-রোগ বেশি হয়ে থাকে।

ভিটামিন বি-১২ ও ফোলেট: এ দু'টো খাদ্যপ্রাণই রক্তের লোহিত কণিকা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কাজেই এগুলোর অভাব হলে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। বিশেষতঃ শিশু ও গর্ভবতী মায়েরাই এধরনের রক্তস্বল্পতায় ভোগে থাকে। প্রাণীজ খাবার থেকে ভিটামিন বি-১২ পাওয়া যায়। এছাড়া অন্ত্রের মধ্যস্থ পরজীবী জীবাণুগুলো এই ভিটামিন তৈরি করতে পারে বলে এই ভিটামিনের অভাব খুব কমই দেখা যায়। পক্ষান্তরে, প্রাণীজ ও উদ্ভিজ উভয় প্রকার খাদ্য যেমন কলিজা, টাটকা শাক-সব্জি, ডাল ইত্যাদি থেকে ফোলেট পাওয়া যায়। গর্ভবতী মা ও শিশুদের এধরনের খাদ্য বেশি পরিমাণে খাওয়ানো উচিত।

ভিটামিন সি বা এ্যাসকরবিক এসিড: মানবদেহের জন্য এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। আমাদের দেহ সরাসরি ভিটামিন সি তৈরি করতে পারে না। হাড় ও দাঁতকে শক্ত করা ছাড়াও ক্ষত সারাতে এই ভিটামিন সাহায্য করে থাকে। এই ভিটামিনের অভাবে 'স্কার্ভি' নামক এক প্রকার রোগ হয়, যার ফলে দুর্বলতা, মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণ ও হাড়ের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে। বর্তমানে এ-রোগের প্রকোপ তেমন একটা দেখা যায় না। আমলকি, পেয়ারা, লেবু, সবুজ শাক-সব্জি ও যেকোনো টকজাতীয় ফলে এই ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে। মনে রাখতে হবে, শাক-সব্জি অনেকক্ষণ ধরে রান্না করলে বা ফলমূল শুকিয়ে খেলে এই ভিটামিনের কোনো কার্যকারিতা থাকে না। এগুলোকে ছোট-ছোট টুকরা করে অনেকক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রাখলেও এই ভিটামিনের কর্মক্ষমতা কমে যায়।

ভিটামিন ডি: মানবদেহের হাড় গঠনে ও এর বৃদ্ধিতে এই ভিটামিনের প্রয়োজন। এর অভাবে শিশুদের 'রিকেট' নামক এক প্রকার রোগ হয়। এ-রোগে শরীরের অস্থিগুলো নরম হয়ে গিয়ে হাত-পা বাঁকা হয়ে যায় এবং শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে যেতে পারে। রোদের সংস্পর্শে আমাদের শরীরের চামড়া থেকে প্রচুর পরিমাণে এই ভিটামিন তৈরি হয়। সেজন্য অন্ধকার ও স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে যে শিশুরা বেড়ে উঠে তাদের এবং অপুষ্ট বাচ্চাদের এ-রোগ হতে পারে। খাদ্য থেকে এই ভিটামিনের অভাব তেমন একটা দেখা যায় না।

ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ এবং কোন্ কোন্ খাবার খেলে তা প্রতিরোধ করা যায় সে-সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। খাবারে খনিজ লবণের অভাব হলে কী কী সমস্যা দেখা দেয় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো। এই খনিজ লবণগুলো যদিও খুব কম পরিমাণে দেহের চাহিদা মেটাতে পারে তবু খাদ্যে এদের অপ্রতুলতা বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে।

লৌহ: রক্তের লোহিত কণিকার অভ্যন্তরে হিমোগ্লোবিন তৈরিতে লৌহ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এর অভাব হলে দেহে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয় এবং রক্তের পরিশোধণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। আমাদের দেশে শতকরা ৭০ ভাগ শিশু ও গর্ভবতী মা রক্তস্বল্পতায় ভোগে থাকে। খাদ্যে লৌহের অভাব ও কৃমিজনিত জটিলতা এই রক্তস্বল্পতার কারণ। উদ্ভিজ খাদ্যের শতকরা মাত্র ২ ভাগ এবং প্রাণীজ খাদ্যের শতকরা ১৫ ভাগ লৌহ আমাদের দেহে পরিশোষিত হয়ে থাকে। সেজন্য খাদ্য থেকে লৌহের চাহিদা মেটাতে হলে পর্যাপ্ত পরিমাণে সব ধরনের খাবার খাওয়া উচিত। শস্যজাতীয় খাদ্য যেমন ডাল, সবুজ শাক-সব্জি, মাংস ও কলিজায় প্রচুর পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায়। জনগণের মধ্যে রক্তস্বল্পতার প্রবণতা লক্ষ্য করে কতকগুলো খাবারকে (যেমন লবণ) লৌহ-সমৃদ্ধ করার কথা পুষ্টিবিদেরা চিন্তা-ভাবনা করছেন।

আয়োডিন: আমাদের দেশে আয়োডিনের অভাবজনিত গলগন্ডের প্রকোপ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পূর্বে ধারণা করা হতো দেশের কোনো কোনো অংশে (যেমন উত্তরাঞ্চল) এ-রোগের প্রকোপ বেশি। সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্রই এ-রোগ বিদ্যমান। গলগন্ড রোগে আক্রান্ত মায়ের গর্ভজাত শিশু নির্বোধ ও পঙ্গু হয়ে জন্মায়। এসব শিশুদের বলা হয় 'ক্রেটিন' এবং এদেরকে সমাজের গলগ্রহ হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টি ও বন্যার ফলে মাটি থেকে আয়োডিন সরে যায়। এই মাটিতে যে ফসল হয় তাতে পর্যাপ্ত আয়োডিন থাকে না। বর্তমানে আমাদের দেশের আয়োডিনযুক্ত লবণের প্রচলন শুরু হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে দেশে উৎপাদিত সমস্ত লবণ আয়োডিনযুক্ত করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এছাড়াও গর্ভবতী মায়েদের আয়োডিন ইনজেকশন দিয়ে শিশুদের আয়োডিনের অভাবজনিত জটিলতা দূর করা সম্ভব।

জিংক: এই খনিজ লবণের অভাবে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অপুষ্ট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই অভাব বেশি দেখা যায়। বিশেষতঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠির দৈনন্দিন খাদ্যে জিংক-এর পরিমাণ খুবই কম থাকে। তবে এই ঘাটতি সামগ্রিকভাবে জনস্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি করে কিনা তা গবেষণার বিষয়।

সবশেষে মনে রাখতে হবে, মানবদেহের পরিপূর্ণ বৃদ্ধি, কর্মক্ষমতা ও সুস্থতার জন্য চাই সব ধরনের খাবারের মিশ্রণে এক সম্পূরক খাদ্য। এই সম্পূরক খাদ্যের চাহিদা মেটায় আমিষ, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ লবণসহ সকল প্রকার পুষ্টি উপাদান। খাদ্য সম্পর্কে উপদেশ দেওয়ার সময় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, সঠিক পরিমাণে সঠিক খাবার খাওয়া হচ্ছে কিনা, পরিবারের সবাই সেই খাবারে অভ্যস্ত কিনা এবং সেই খাবার থেকে শরীরের পুষ্টি উপাদানগুলোর চাহিদা মিটছে কিনা। শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম এবং সেই সাথে এর বৃদ্ধির জন্য দামী খাবার গ্রহণের দরকার নেই, কেননা আমাদের আশপাশের সস্তা খাবার দিয়েই এই সম্পূরক খাবার তৈরি করা যায়।

শিশুর জন্য মায়ের দুধ

হোসনে আরা রহমান

জন্মের পর থেকেই শিশু তার মায়ের দুধ খাবে এটাই প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক নিয়ম। পৃথিবীতে যখন থেকে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে প্রতিটি স্তন্যপায়ী প্রাণী তার শিশুকে জন্মের পরপরই স্তন্য পান করিয়ে আসছে। জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে তাদের বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে সমস্যা কম, কিন্তু মানুষের বেলায় বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে মা ও শিশুকে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

আজ বিশ্বব্যাপী একই শ্লোগান "শিশুকে জন্মের পরপরই মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে এবং শিশুর ৫ মাস বয়স পর্যন্ত সে 'কেবলমাত্র বুকের দুধই' খাবে"। আর ৫ মাস বয়সের পর বুকের দুধ খাওয়ানোর পাশাপাশি নরম করে রান্না করা খাবার শিশুর চাহিদা মত দিনে ৩ থেকে ৪ বার খাওয়াতে হবে। এভাবে দু'বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাইয়ে যেতে হবে।

এত শ্লোগান ও প্রচারণা সত্ত্বেও ক'জন মা তাঁর শিশুকে জন্মের পরপরই কেবলমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে সক্ষম হচ্ছেন? গ্রাম-গঞ্জ থেকে শুরু করে দেশের বৃহৎ মহানগরীর অধিকাংশ মায়েরাও জানেন না শিশুকে কখন থেকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, কেন খাওয়াবেন এবং কেমন করে খাওয়াবেন? এই মায়েরা অনেকেই অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত। তবে অনেক সুশিক্ষিত মায়েরাও সঠিকভাবে বুকের দুধ খাওয়াতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

একজন মহিলার গর্ভে যখন সন্তান আসে তখন থেকেই তার স্তনে যে পরিবর্তন ঘটে সেটাই হচ্ছে তার গর্ভবতী হওয়ার সূচনা। এর কিছুদিন পর স্তনে আরো পরিবর্তন ঘটে ও স্তনে দুধ জমতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ বিধাতা শিশুর জন্মের পূর্বেই তার আহারের ব্যবস্থা করে রাখেন।

কেবলমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি কেন?

বুকের দুধ না খাওয়ানোর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে: প্রসবের কিছুক্ষণ পরই শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে এব্যাপারে মা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন না। গ্রামাঞ্চলে যেসব এলাকায় কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই, সেসব এলাকার কথা বাদ দিলেও উপশহর বা বড় বড় শহরগুলোতে যেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন, সরকারি হাসপাতাল, এ্যানটিন্যাটাল কেয়ার ইউনিট ও আধুনিক ক্লিনিক আছে যেখানে কর্মরত রয়েছেন ধাত্রী ও প্রসূতিবিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রীধারী চিকিৎসক, শিশু বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী ও নার্স, সেখানেও যখন একজন গর্ভবতী মহিলা তাঁর গর্ভকালীন নিয়মিত পরীক্ষা (routine check up) করাতে যান তখন তাঁর স্তনের কি অবস্থা, বোটা ঠিক আছে কিনা এগুলো দেখা তো দূরের কথা, সেগুলো সম্পর্কে অনেকক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এমনকি সন্তান প্রসবের পরপরই যে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে এই কথাটাও বুঝিয়ে বলা হয় না। ফলে মা এই অতীব প্রয়োজনীয় ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেন না। শিশুর জন্মের পর বাড়ির মুরুব্বি মহিলারা নবজাতককে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে মায়ের শরীরের প্রতি অনেক সময় খেয়াল রাখা হয় না। জন্মের সাথে সাথে শিশুকে বুকের দুধ না খাওয়ালে মায়ের স্তনে দুধ জমে ব্যথায় জ্বর হতে পারে। তখন শিশুকে মায়ের কাছে দেওয়া হয়। আর জমে

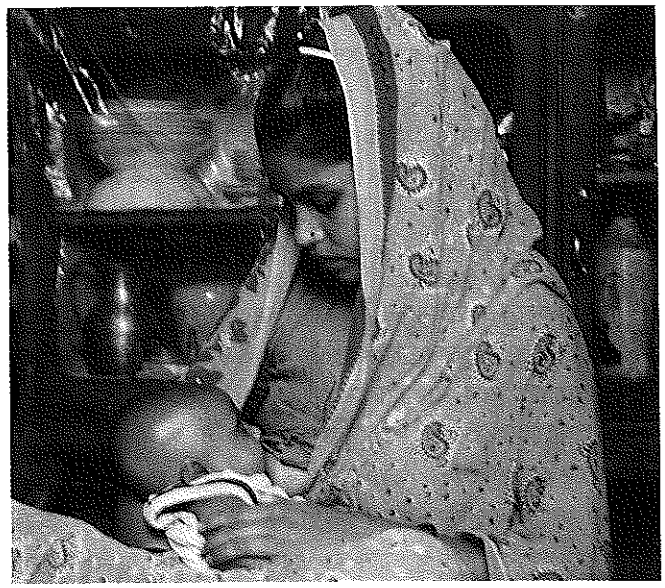

থাকা দুধ কিছুটা ফেলে দিয়ে শিশুকে স্তন চোষানোর চেষ্টা করা হয়। ৩ থেকে ৪ দিন বয়সের শিশুকে মধু, মিশ্রির পানি, চিনির পানি, গরু বা ছাগলের দুধ, আর তার সাথে টিনজাত দুধও দেওয়া হয়। জন্মের পরপরই যে শিশুকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে সেটা কেউই ভাবেন না। বাড়ির মুরুব্বি মহিলারা নতুন মায়ের কষ্টে ব্যথিত হন মাত্র। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাচ্চাটাকে তাঁরাই দেখাশুনা করেন। আর আজকের যুগের মায়েদের সামান্য স্বাস্থ্যশিক্ষা থাকলেও বাড়ির মুরুব্বিরা তাকে পাত্তা দেন না। আর মা-ও যেঁচে বলতে পারেন না মুরুব্বিরা কি ভাববেন বা কি বলবেন এই অন্তর্দ্বন্দ্বে। মায়ের মধ্যে একটা দ্বিধা-লজ্জা থেকেই যাচ্ছে। অন্যদিকে মায়ের স্তনে কোনো সমস্যা আছে কিনা, সেটা দেখার বা সমাধান দেওয়ারও কেউ নেই। তাঁদের শুধু এটুকুই ধারণা যে মায়ের দুধে দোষ আছে বা দুধে উপরি বাতাস লেগেছে এবং এই দুধ খাওয়ালে শিশুর ক্ষতি হবে। সে কারণেই শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং আলগা দুধের উপর ভরসা করা হয়। আর যদি বড় বা যৌথ পরিবার হয়, সে-বাড়িতে মায়ের এত সময় কোথায় যে সংসারের সব কাজ ফেলে রেখে মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন। এছাড়া আমাদের দেশে মেয়েদের এত অল্প বয়সে বিয়ে হয় যে তার নিজের দেহটাই সম্পূর্ণ বেড়ে উঠেনি, সেই দেহে আবার নতুন করে আর এক দেহের গড়ন। এই মায়েদের বেশিরভাগেরই প্রসবকালীন বা প্রসবোত্তর সমস্যা অনেক বেশি দেখা দেয়। আর মা এত দুর্বল বা অসুস্থ থাকেন যে নবজাতককে ঠিকভাবে লালন-পালন করতে পারেন না। এ-অবস্থায় শিশুর লালন-পালন হয় দাদি বা নানি, না হয় অন্য কোনো মুরুব্বির কোলে, আর তার খাবার হয় আলগা দুধ—এই হচ্ছে মুরুব্বি-শাসিত সংসারের চিত্র।

মফস্বল শহর এমনকি বড় বড় শহরেও অনেক মেয়েদের লেখাপড়া চলাকালীন বিয়ে হয় এবং এদের মধ্যে মাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের মেয়েরাও রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার বিয়ের পরও লেখাপড়া চালিয়ে যান। এসব ছাত্রী-মায়েরা কিভাবে বুকের দুধ ঠিক মত খাওয়াবেন? এছাড়া চাকরিজীবী মহিলাদের সমস্যা আরো ভিন্নতর। সরকারি চাকরি হলে মাত্র ৩ মাস ছুটি পান—দেড় মাস প্রসবের আগে, আর দেড় মাস প্রসবের পরে। এই দেড় মাসের শিশুকে রেখে মাকে চাকরিতে যেতে হলে তিনি কিভাবে তাঁর শিশুকে

বুকের দুধ ঠিকমত খাওয়াবেন? গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা আরও হতাশাব্যঞ্জক। এখানে ৩ মাসের ছুটি তো নেই-ই, বরং কাজ থেকে অনুপস্থিতির দিনগুলোর জন্য তাঁদের বেতন কেটে রাখা হয়। এমনও দেখা গেছে, আর্থিক অসুবিধার কারণে প্রসবের ১৫ দিন পরই মাকে কাজে যেতে হয়। আর যদি একজন মাকে প্রতিদিন ৮ থেকে ১২ ঘন্টা কাজ করতে হয় তাহলে তিনি কি করে তাঁর শিশুকে ঠিকমত বুকের দুধ খাওয়াবেন?

অন্যদিকে শহুরে বিত্তবানদের সমস্যা ভিন্নতর। তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে ঘরের বাইরে কাজ করেন না, কিন্তু তাঁদের বাচ্চাদেরকে দেখাশুনা করে থাকে আয়ারা। আর দুধ বানিয়ে খাওয়ানো আয়াদের কাজ। শহুরে বিত্তবান মায়েদের তাঁদের শিশুদের বুকের দুধ না খাওয়ানোর কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। তাঁরা প্রভাবিত হন পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা বা গুঁড়া দুধের অতিরিক্ত প্রচারণার দ্বারা। তাঁরা বিনা কারণেই তাঁদের শিশুদেরকে বুকের দুধ খাওয়ান না এবং তাঁদের এই না-খাওয়ানোর প্রভাব সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সবার উপর পড়ছে। এতসব সামাজিক, অর্থনৈতিক, শারিরীক, মানসিক অনভিজ্ঞতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের কারণে শিশুকে কেবলমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা সমাজের কোনো স্তরেই পরিপূর্ণভাবে পালিত হচ্ছে না। আর যতটুকু হচ্ছে তাও নগণ্য।

আমাদের করণীয়

১. গর্ভবতী মায়েদের ভালভাবে শরীরের যত্ন নিতে হবে।

২. তাঁদের শিশুদেরকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে কোনো শারিরীক অসুবিধা আছে কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩. মা তার স্তনের যত্ন কিভাবে নিবেন তা তাঁকে শেখাতে হবে।

৪. শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে মানসিকভাবে মাকে প্রস্তুত করতে হবে।

৫. পারিপার্শ্বিক কোনো বাধা থাকলে তা সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে।

৬. সন্তান জন্মের পর কখন থেকে মা তাঁর শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন তা শেখাতে হবে।

৭. মা নবজাত শিশুকে কিভাবে কোলে নিয়ে বুকের দুধ খাওয়াবেন তা শেখাতে হবে।

৮. কোলে না নিতে পারলে কিভাবে শুয়ে বা আধা-শুয়ে বুকের দুধ খাওয়াবেন তাও শেখাতে হবে।

৯. দু'পাশেই সঠিকভাবে বুকের দুধ খাওয়ানোর পদ্ধতি জানাতে হবে।

১০. বুকের দুধের উপকারিতা কী তা বুঝাতে হবে।

১১. কেন মায়ের বুকের দুধ শিশুর শারিরীক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন তা বোঝাতে হবে।

১২. কত ঘন-ঘন বুকের দুধ খাওয়াবেন তা বলতে হবে।

১৩. দু'বছর পর্যন্ত যাতে তাঁর শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন সেজন্য মায়ের কী কী করণীয় তা বলতে হবে।

১৪. চাকুরিজীবী মায়েদের চাকুরি ও বেতনের নিরাপত্তা থাকতে হবে এবং প্রসবোত্তর ছুটির (maternity leave) মেয়াদ বাড়াতে হবে।

১৫. সব রকম অফিস, আদালত ও মিল-ফ্যাক্টরীর সাথে nursery খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬. শিক্ষার্থী মায়েরা সম্ভব হলে ক্লাসের অবসরে এসে তাঁদের শিশুদেরকে বুকের দুধ খাওয়াবেন এবং ক্লাস শেষে বাসায় ফিরে নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়াবেন।

১৭. 'মায়ের দুধের বিকল্প' অন্য কোনো দ্রব্যের যেকোনো প্রচারণা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

১৮. দুগ্ধজাত শিশুখাবার প্রকাশ্যে বিক্রয় বন্ধ করতে হবে।

১৯. বাড়িতে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বাড়ির মুরুব্বিদের সাথে আলাপ করতে হবে যেন মা তাঁর শিশুকে একান্তে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন।

২০. যেকোনো ভুল ধারণা ও কুসংস্কার দূর করে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে হবে।

২১. কোনো মা যদি মনে করেন জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খাওয়ার ফলে বুকের দুধ কমে গেছে তাহলে বড়ির বদলে অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করার পরামর্শ দিতে হবে।

২২. শিশুর অধিকার ও শিশুর প্রতি বাবার দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে বাবাকে সচেতন করে তুলতে হবে।

উপসংহার

জন্মের পর মায়ের দুধ পাওয়া শিশুর জন্মগত অধিকার। অতএব এ-বিষয়টি বিবেচনায় রেখে শিশুর স্বার্থ রক্ষার্থে শিশুর জন্মের পর অথবা শিশুর জন্মের আগে থেকেই আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে এবং বুকের দুধ খাওয়ানোর নীতিমালা মেনে চলতে হবে। আর এই নীতিমালা সামনে রেখে সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ করে যাঁরা মা ও শিশু স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত আছেন তাঁদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। যেখানে গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুবিধা আছে, যেমন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, মাতৃ ও শিশু সদনগুলোকে এসমস্ত কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

সুস্থ ও সবল শিশুরাই একটি সুন্দর জাতি উপহার দিতে পারে। একমাত্র একজন সুস্থ ও সবল মা-ই পারেন একটি সুস্থ ও সবল শিশু উপহার দিতে। তাই মাকে হতে হবে সুস্থ ও সবল, যার বুকের দুধে বেড়ে উঠবে সুন্দর একটি শিশু—একজন সুন্দর ভবিষ্যৎ নাগরিক।

একটি প্রস্তাব

মাঠকর্মীদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে পারদর্শী করে তুলতে হবে, কারণ আমাদের দেশের বৃহৎ জনসংখ্যা গ্রামাঞ্চলে বাস করে যাদের মধ্যে এখনো এই বিষয়ে অজ্ঞতা ও নানা কুসংস্কার রয়েছে। এসব বেড়াজাল দূর করতে সুদক্ষ মাঠকর্মীর প্রয়োজন, যারা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে গর্ভবতী মায়েদের খোঁজ-খবর নেবেন এবং বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে তাঁদেরকে উৎসাহিত করবেন। প্রয়োজনবোধে পরিবারের মুরুব্বিদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে শিশুকে 'কেবলমাত্র বুকের দুধ' খাওয়ানো নিশ্চিত করতে হবে।

বাতজ্বর

(২য় পাতার পর)

বাতজ্বর হলে কি করবেন?

- বাতজ্বরের উপসর্গ দেখা গেলে রোগীকে অবশ্যই বিশ্রাম নিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আক্রান্ত গিরা (inflamed joint) কোনো রকম নড়াচড়া করা না হয়।
- গলা ব্যথা হলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে রোগীর মাংসপেশীতে একটি মাত্র বেনজাথিন পেনিসিলিন ইনজেকশন দিতে হবে অথবা ৬ ঘন্টা পরপর দিনে ৪ বার পেনিসিলিন ট্যাবলেট একনাগারে ১০ দিন খাওয়াতে হবে। জীবাণুনাশক (antibiotic) "পেনিসিলিন জি" দিয়েও সফল চিকিৎসা করা সম্ভব। দিনে ২ বার ১২৫ থেকে ১৫০ মিঃগ্রাঃ মাত্রায় একনাগারে অন্ততপক্ষে ৫ বছর অথবা রোগীর বয়স ২০ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এ-ওষুধ খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায় অথবা প্রতিমাসে ১০ লক্ষ ইউনিট বেনজাথিন পেনিসিলিন ইনজেকশন মাংসপেশীতে নিতে পারলে ভাল ফল পাওয়া যায়। পেনিসিলিনে কারো এলার্জি থাকলে চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীকে জানাতে হবে।
- কারো পেনিসিলিন সহ্য না হলে (hypersensitive/allergic) তাকে এরিথ্রোমাইসিন দিয়ে চিকিৎসা করা যায়।
- স্টেরয়েড (প্রতিদিন ৪০ থেকে ৮০ মিঃগ্রাঃ প্রেডনিসোলন) দিয়েও অনেকে তাড়াতাড়ি ব্যথা কমানোর জন্য চিকিৎসা করেন। এ্যাসপিরিনের সাথে স্টেরয়েডের ব্যবহারে কোনো বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায় কিনা তা এখনো প্রমাণিত হয়নি। তবে এ্যাসপিরিনে ব্যথা না কমলে স্টেরয়েড দেওয়া যথার্থ হবে।
- বাতজ্বরে আক্রান্ত রোগীকে খুব যত্ন করে অবশ্যই রুচিশীল পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোনো কারণে রোগীর খাদ্যের পরিমাণ কমে না যায়। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে রোগীকে সবসময় উৎসাহিত করতে হবে।

প্রতিরোধ

ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় একজন রোগী থেকে অনেকেই অতি সহজে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে, কাজেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া অতি প্রয়োজন।

বাতজ্বর অথবা এর জটিলতা প্রতিরোধ করতে হলেঃ

- শিশুদের বা কিশোরদের জ্বর ও গলা ব্যথা হলেই স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- হাঁচি বা কাঁশি দেওয়ার সময় সবসময় রুমাল বা হাত দিয়ে নাক-মুখ অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে।
- পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং শিশু-কিশোরদের পর্যাপ্ত আলো-বাতাসে খেলতে দিতে হবে।
- একই ঘরে বা বিছানায় বেশি লোক ঘুমানো যাবে না।
- চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খেতে হবে এবং কখনো হঠাৎ করে ওষুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না। ওষুধ খেতে কোনো রকম অসুবিধা হলে আবার চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- সুষম এবং পুষ্টিকর খাবার পরিবারের সকলকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- অতিরিক্ত ঠান্ডা খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। শিশুদের বেলায় এব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বাতজ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাংলাদেশে খুব বেশি না হলেও এখানে শিশুদের বা কিশোরদের বাতজ্বরই হৃদরোগের প্রধান কারণ হওয়াতে এটি একটি মারাত্মক সমস্যা। তাছাড়া আমাদের দেশে শিশু-কিশোরদের অপুষ্টিও ব্যাপক, ফলে বাতজ্বর হলে জটিলতাও বেশি দেখা যায়। শিশুদের গলা ব্যথাকে অবহেলা করলে পরবর্তীকালে গিরা ব্যথা না হয়ে হয়তো তাদের হৃদযন্ত্রের জটিলতা দেখা দিলে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকিও বেড়ে যায়। তাই আসুন, আমরা বাতজ্বরের প্রাথমিক উপসর্গ সম্বন্ধে অভিভাবকদের সচেতন করে তুলি, যাতে তাঁরা সকলেই সাবধান হন এবং এ-রোগ থেকে তাঁদের সন্তানদের সহজে রক্ষা করতে পারেন।

স্বাস্থ্য কুইজ—১৪

১. গর্ভকালীন প্রধান জটিলতাসমূহ কী কী?

২. একজন গর্ভবতী মায়ের খাদ্যে আয়োডিনের প্রয়োজন কেন?

৩. নবজাত শিশুর ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হবার কারণসমূহ কী কী?

৪. মায়ের বুকের দুধ কি কখনো নষ্ট হতে পারে?

৫. ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুকে বুকের দুধ দেওয়া প্রয়োজন কেন?

(উত্তর আমাদের কাছে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫ তারিখের আগেই পৌঁছাতে হবে)

স্বাস্থ্য কুইজ—১৩ এর উত্তর

১. UNICEF এর তথ্য অনুযায়ী (Progress of Nation's Report '95) ১৪৫টি দেশ পোলিওমুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশে পরপর ১৯৯৫, ১৯৯৬, ১৯৯৭ সাল এই ৩ বছর জাতীয় NID পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

২. রোগীর যখন হঠাৎ কাঁপিয়ে জ্বর আসবে, রোগীর বমি-বমি ভাব থাকতে পারে। জ্বর কমে গেলে রোগী স্বাভাবিক বোধ করবেন।

৩. UNICEF এর মতে (Progress of Nation's Report) বাংলাদেশে এপর্যন্ত ৩৫ ভাগ লোক স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থার আওতায় এসেছে।

৪. স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থা থাকতে হবে এবং কাঁচা খাবার ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে খেতে হবে। প্রতিবার পায়খানায় যাবার পর হাত সাবান অথবা ছাই দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।

নখ ছোট এবং পরিষ্কার রাখতে হবে।

কৃমি-আক্রান্ত হলে চিকিৎসা করতে হবে।

৫. ঢেঁকি-ছাটা চালে ভিটামিন বি থাকে এবং এর অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়।

(স্বাস্থ্য কুইজ—১৩ এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেন নি)

জেনে রাখা ভাল

ঘরে-তৈরি স্যালাইন

আপনি নিজে গুড় অথবা চালের গুঁড়া দিয়ে বাড়িতে স্যালাইন তৈরি করে একবার পাতলা পায়খানা হবার সাথে সাথেই রোগীকে খাওয়াবেন।

• লবণ-গুড়ের স্যালাইন

আধা লিটার খাবার পানির সাথে তিন আঙ্গুলের প্রথম দাগের সমান এক চিমটি লবণ ও এক মুঠ যেকোনো ধরনের গুড় ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। স্যালাইন বানানোর সময় লবণ, গুড় ও পানির পরিমাণ অবশ্যই ঠিক রাখতে হবে। গুড় না পেলে এক মুঠ চিনি ব্যবহার করা যাবে।

• চালের গুঁড়ার স্যালাইন

এক মুঠ চাল (আতপ বা সিদ্ধ) ১০/১৫ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে তারপর পিষে নিন। (মশলা পেষার শিল-নোড়া পরিষ্কার করে ধুয়ে নেবেন)। এবার চালের গুঁড়াকে আধা লিটার পানিতে ভাল করে গুলিয়ে নিন। এখন আরো আধা কাপ পানি মেশান। জ্বাল দেওয়ার সময় বাষ্প হয়ে কমে যায় বলে এই বাড়তি পানি মেশাতে হবে। এবার একটি পরিষ্কার হাঁড়িতে এই পানিতে গুলানো চালের গুঁড়াকে উনুনে প্রায় ১০ মিনিট জ্বাল দিন। জ্বাল দেওয়ার সময় অনবরত নাড়তে থাকুন। ফুটে উঠলেই অর্থাৎ বুদবুদ দেখা দিলেই হাঁড়ি নামিয়ে নিন। এখন এক চিমটি (বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী এবং মধ্যমার প্রথম ভাঁজ পর্যন্ত) লবণ মিশিয়ে দিন। এই চালের গুঁড়ার স্যালাইন রোগীকে বারবার খাওয়ান। মাঝেমাঝে বিশুদ্ধ খাবার পানিও রোগীকে খাওয়াবেন। ৬ ঘন্টার বেশি রাখলে চালের গুঁড়ার স্যালাইন নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই প্রয়োজন হলে পুনরায় স্যালাইন তৈরি করতে হবে।

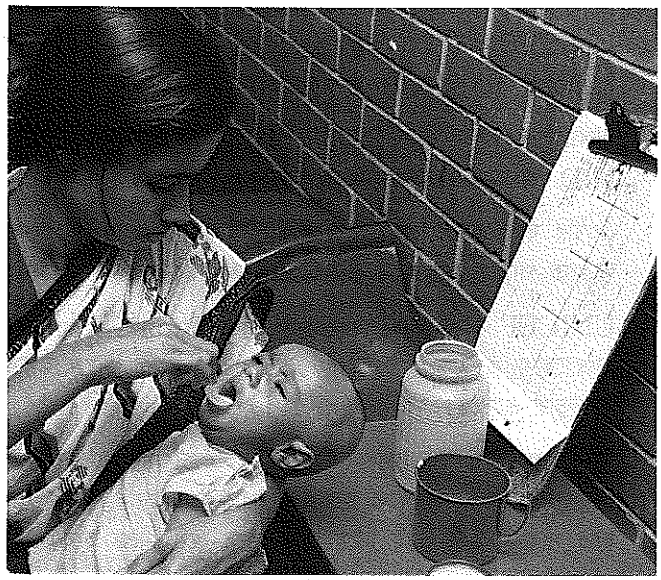

এভাবে কোলে বসিয়ে বাচ্চাকে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়াতে হবে

এই স্যালাইন শুধু জলশূন্যতাই পূরণ করে না, পুষ্টিরও যোগান দেয়। তাছাড়া এই স্যালাইন পরিমাণেও কম লাগে।

চালের গুঁড়ার স্যালাইন অপেক্ষাকৃত ভাল কারণ

১. চাল সবার ঘরেই পাওয়া যায়
২. বেশি পুষ্টিকর
৩. খরচ কম
৪. সহজেই গ্রহণীয়
৫. সহজ পাচ্য
৬. এই স্যালাইন ব্যবহারে রোগী অপেক্ষাকৃত কমসময়ে সুস্থ হয়ে ওঠে।

খাবার স্যালাইন ব্যবহারের নিয়মাবলী

১. পাতলা পায়খানা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই খাওয়ার স্যালাইন খাওয়ানো শুরু করতে হবে। স্যালাইন খাওয়ানো শুরু করতে যত বেশি দেরী হবে রোগীর অবস্থা ততই খারাপ হবে।

২. পাতলা পায়খানা ও বমির পরিমাণ মোটামুটি আন্দাজ করে কমপক্ষে সেই পরিমাণ স্যালাইন রোগীকে খাওয়াতে হবে। (শুরু করতে যদি দেরী হয়, তবে প্রথমে রোগীকে কিছু বেশি পরিমাণে স্যালাইন খাওয়াতে হবে।)

৩. বমি হলেও স্যালাইন খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না। অল্প-অল্প স্যালাইন কিছুক্ষণ পর পরই খাওয়াতে হবে।

৪. যতদিন পর্যন্ত পাতলা পায়খানা চলতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত স্যালাইন খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে। ৭২ ঘন্টার বেশি ডায়রিয়া চলতে থাকলে রোগীকে নিকটস্থ চিকিৎসা কেন্দ্রে নিতে হবে।

৫. স্যালাইন খাওয়ানোর মাঝে মাঝে, বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের, অল্প-অল্প বিশুদ্ধ পানি খেতে দেওয়া উচিত।

৬. মনে রাখবেন, খাওয়ার স্যালাইন কম খাওয়ানোর চেয়ে কিছুটা বেশি খাওয়ানো ভাল।

৭. অল্প-অল্প করে পরিষ্কার চামচ বা ঝিনুক দিয়ে বাচ্চাদেরকে স্যালাইন খাওয়াতে হবে। বাচ্চাকে শোয়া অবস্থায় পানি বা খাওয়ার স্যালাইন দেবেন না, নাকে মুখে উঠতে পারে।

৮. একবার স্যালাইন তৈরির পর যদি ১২ ঘন্টার মধ্যে সবটুকু খাওয়ানো না হয় তবে বাকিটুকু ফেলে দিয়ে নতুন করে তৈরি করতে হবে। চালের গুঁড়ার স্যালাইন ৬ ঘন্টার বেশি রাখা যাবে না।

৯. পেটের অসুখ থাকাকালীন রোগীকে স্বাভাবিক খাবার ও তার সাথে ডাবের পানি ও দু-একটা কলা খেতে দিলে ভাল হয়।

১০. খাওয়ার স্যালাইনের প্যাকেট পাওয়া গেলে, প্যাকেটের গায়ে লেখা নিয়ম অনুযায়ী স্যালাইন তৈরি করতে হবে।

১১. খাওয়ার স্যালাইন দেওয়ার পরেও যদি রোগীর অবস্থা খারাপ হয়, যেমন পেট ফাঁপা (পেট ফুলে যাওয়া), হাত-পা খিঁচুনি, শ্বাস কষ্ট হওয়া, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়, তবে রোগীকে নিকটস্থ হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে; **সম্পাদক** ঃ ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক** ঃ এম. শামসুল ইসলাম খান; **কনসালটেন্ট এডিটর** ঃ ডাঃ মোড়ল নজরুল ইসলাম; **সদস্য** ঃ ইউসুফ হাসান, মুহম্মদ মজিবুর রহমান, ডাঃ তানজিনা মির্জা, ডাঃ শামীম এ. খান, ডাঃ অমল মিত্র ও শামীম আরা জাহান; **ডিজাইন** ঃ আসেম আনসারী; **প্রকাশক** ঃ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০। ফোন ঃ ৬০০১৭১-৮; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬; টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আইসিডিডি বি.জে

মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা বাংলাদেশ